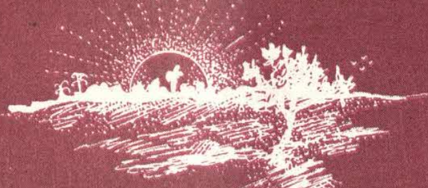
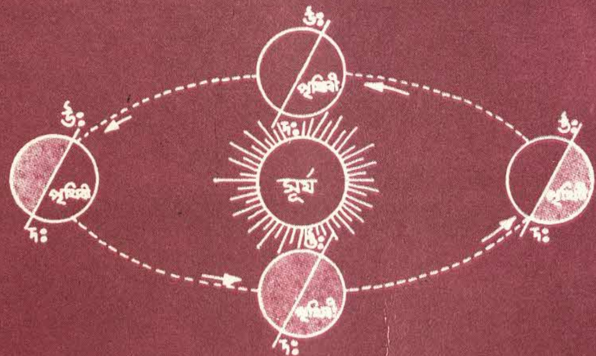


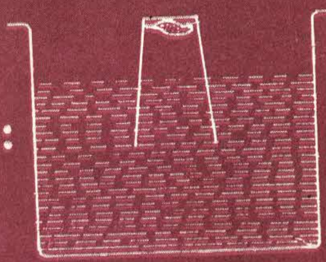


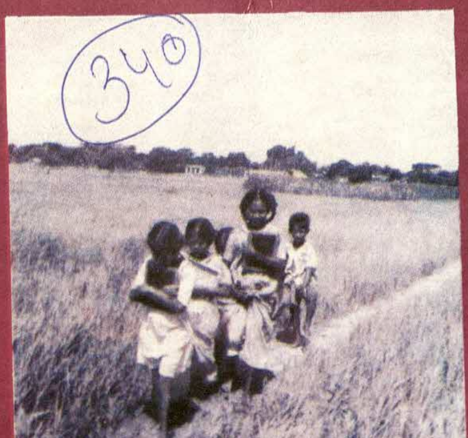


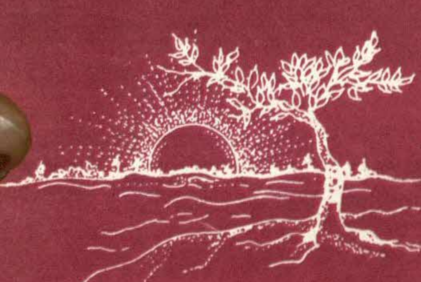


প্রাথমিক স্তরে সামর্থ্য ভিত্তিক পঠন-পাঠনঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা











রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ





প্রাথমিক স্তরে সামর্থ্য ভিত্তিক পঠন-পাঠন :
একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

২৫/৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড

কলিকাতা - ৭০০ ০১৯

দূরভাষ - ৪৭৫-৪৩৭৭

পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক ঃ
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ● পশ্চিমবঙ্গ
২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০১৯

প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

প্রচ্ছদপট রূপায়ণে
ডঃ ধীরাজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ
অনামিকা এন্টারপ্রাইজেস
৩৬ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

পুস্তিকাখানি সম্পর্কে দু-চার কথা

সারাজীবন আমি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। কখনো উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে কখনো বা বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে। শিক্ষা সম্পর্কে যে উপলব্ধিতে আমি পৌঁছেছি তাতে একটা কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি। বুনিয়াদ শক্ত না হলে যেমন ভাল ইমারত তৈরী হয় না তেমনি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরটি যদি যথেষ্ট শক্তপোক্ত এবং ফলপ্রসূ না হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা থেকে ফললাভের আশা বৃথা।

প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে চারটি স্তম্ভের ওপরে। এগুলি হল, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন পদ্ধতি। একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকাদি অত্যন্ত উন্নত মানের। পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া মূলতঃ নির্ভর করে শিক্ষকদের ওপর। শিশুকেন্দ্রিক ও কর্মভিত্তিক যে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার কথা আজকের দিনে চারিদিকে বলা হচ্ছে তার মূল হল সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন প্রকৌশল। শিক্ষকরা যাতে সার্থকভাবে এর প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য তাদের বিশেষ অভিমুখীকরণের প্রয়োজন আছে। মূলতঃ এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমরা প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি।

এই কাজ শুরু করে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন প্রকৌশল বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম শিখন ইত্যাদি ধারণা সম্পর্কে শিক্ষকদের পরিষ্কার থাকা দরকার। গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে আমি অংশগ্রহণ করেছি। মূল বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি একত্রিত করে একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। জেলাস্তরে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষকেরা অনেক সময়ই এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশনার কথা আমাকে বলেছেন। বর্তমান পুস্তিকাখানি তাদের সেই অনুরোধ এবং চাহিদা পূরণের প্রয়াস মাত্র।

মনে রাখা দরকার, সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন প্রকৌশল এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা নিয়ে আমি এখানে যে বক্তব্য পেশ করেছি সেগুলি চূড়ান্ত বা শেষ কথা নয়। এব্যাপারে কারো কাছ থেকে কোন পরামর্শ, ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত তথ্যাদি সাদরে গৃহীত হবে।

পুস্তিকাটি রচনার কাজে আমাকে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করেছেন আমার অনুজ প্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর উৎসাহ, নিরলস চেষ্টা ও পরিশ্রমের জন্য রইল আমার অপরিমেয় স্নেহ। এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছে ডঃ ধীরাজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্য তাকে ধন্যবাদের বদলে জানাই আশীর্ব্বাদ।

পরিশেষে, যাঁদের জন্য আমার এই প্রয়াস পুস্তিকাখানি তাদের কাজে লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক বলে আমি মনে করব।

ত্রুটি-বিচ্যুতির সমস্ত দায়ভার অবশ্যই আমার।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮
২৫/৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০১৯

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ

বছর খানেক আগে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের দায়িত্বভার নেবার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যাপারে একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। বিগত এক বছরে এই প্রশিক্ষণের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ার সুবাদে আমাকে গ্রামে গ্রামান্তরে প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। শিক্ষকদের সঙ্গে সুযোগ ঘটেছে প্রাথমিক স্তরে পঠন-পাঠন প্রকৌশল নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবার। প্রশিক্ষণে মূল যে বিষয়গুলির উপর আমরা জোর দিতে চেয়েছি সেগুলি হল ঃ (১) সামর্থ্য ভিত্তিক পঠন-পাঠন প্রকৌশল, (২) তথাকথিত পাশ-ফেল প্রথা, (৩) ন্যূনতম শিখনের মান বা এম এল এল, (৪) ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলগুলি পরিচালিত সমান্তরাল বিকল্প ব্যবস্থার অসারতা এবং সবশেষে (৫) সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা। বিষয়গুলি অবশ্যই বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সামর্থ্য ভিত্তিক পঠন-পাঠন প্রকৌশলের মূল কথা হল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জন। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ দেবেন যাতে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারে। তবে পাঠদান করতে হবে তার বর্তমান সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখেই। বর্তমান সামর্থ্য বিচার করে আরও সামর্থ্য অর্থাৎ আরও পুষ্টি ও পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই হবে শিক্ষকের লক্ষ্য। সে পাঠ গ্রহণে কেউ অসমর্থ হলে, অপারগ হলে তাকে দিতে হবে সংশোধনী পাঠ।

ব্যাপারটি ঠিক একটি শিশুর শারীরিক পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়। জন্মের পর শিশুর প্রথম ও প্রধান খাদ্যই হল মাতৃদুগ্ধ। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার খাবারের প্রকৃতিরও পরিবর্তন দরকার। এইভাবেই তার শরীরের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে। উল্টোদিক থেকে বলা যায় যে জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই তাকে যদি মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে আরও কঠিন খাবার দেওয়া হয় তবে তার শরীরের বিকাশ তো দূরের কথা, তার প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। উদাহরণটি আরও একটু প্রসারিত করা যাক। ধরা যাক একটি অঞ্চলে চারটি শিশুর জন্ম হয়েছে। মাস তিনেক বাদে দেখা গেল একটি শিশু অন্য তিনটি শিশু যে খাবার খেতে পারছে তা সে খেতে পারছে না। সেক্ষেত্রে উপায় হল হয় আমাদের মা-দিদিমাদের সনাতন পদ্ধতি অবলম্বন করে অথবা হোমিওপ্যাথি বা এলোপ্যাথি ইত্যাদি ওষুধ প্রয়োগ করে তাকে ঠিক করে তোলা যাতে সে অন্য তিনটি শিশুর

মত ওই বয়সের স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। তার খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা বা সামর্থ্য অন্য তিনটি শিশুর সামর্থ্যের সমান করা হল যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে বলতে পারি সংশোধনী চিকিৎসা প্রক্রিয়া।

এই উদাহরণটি সামনে রেখে আমরা আমাদের সামর্থ্য-ভিত্তিক পঠন-পাঠন পদ্ধতির আলোচনায় ফিরে আসি। বিদ্যালয়ের নবাগত একটি শিশু প্রথম পর্য্যায়ে অক্ষর চিনে অক্ষরটির নাম বলতে পারবে না। এখান থেকে শিক্ষকের কাজ শুরু হল। পাঠদানের ফলে আস্তে আস্তে তার অক্ষর পরিচয় ঘটবে। তারপর অক্ষর পাশাপাশি দেখে শব্দের সঙ্গে পরিচয়। এইভাবে সে আস্তে আস্তে অনেক সামর্থ্যই অর্জন করতে পারবে। পরবর্তী ৩ নম্বর পাতায় ১নং ছকের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল।

আজকের এই বহুল আলোচিত সামর্থ্য-ভিত্তিক পঠন-পাঠন পদ্ধতির মূল উৎস খুঁজে বার করতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয়ের দিকে। প্রথমে অ, আ ইত্যাদি স্বরবর্ণগুলি শেখানোর পর তিনি বর্ণগুলি পরের পাতায় উল্টে দিয়ে স্বরবর্ণ পরিচয়ের সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন। এখনকার পরিভাষায় একে বলতে পারি তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন। এরপর এনেছেন ব্যঞ্জনবর্ণ ও তার সামর্থ্য-ভিত্তিক মূল্যায়ন। ক্রমে ক্রমে সোজা সোজা শব্দ পরিচয় (কর, খল, ঘট ইত্যাদি) পর্য্যায় অতিক্রম করে নিয়ে গেছেন কঠিন শব্দ (ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য) ও আরও পরে বাক্য গঠনের দিকে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পাঠ ব্যবস্থাও অনুরূপ। অক্ষর পরিচয় দিয়ে শুরু করে, ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট শব্দ ও তারপর ছোট ছোট শব্দের সাহায্যে সোজা সোজা বাক্যের (যেমন, বনে থাকে বাঘ। জলে থাকে মাছ। ইত্যাদি) দিকে সামর্থ্যকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন। এরপর এসেছে আরও কঠিন শব্দ (আদ্যনাথ, ধূমধাম, শৈলমাসী, পূজা ইত্যাদি)। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য আসলে হল খুব পরিচিত আশপাশের জগতের জীবজন্তু, পশুপাখী, জিনিসপত্রের দ্যোতক ব্যবহার করে শিশুর স্বাভাবিক ভাবনাকে রক্ষা করে সামর্থ্যগুলিকে তার মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়া।

ছক ঃ ১ সামর্থ্যের ক্রম পর্য্যায়

	১ম পর্য্যায়	দ্বিতীয় পর্য্যায়	তৃতীয় পর্য্যায়	চতুর্থ পর্য্যায়	পঞ্চম পর্য্যায়	ষষ্ঠ পর্য্যায়	৭ম পর্য্যায়
ভাষার ক্ষেত্রে	অক্ষর পরিচয় নেই সামর্থ্য শূন্য ঃ অতএব 'ব' বলতে পারে না।	অক্ষর চেনে 'ব' বা 'ন' বলতে পারে, কিন্তু শব্দ 'বন' পর্য্যন্ত সামর্থ্য পৌঁছায় নি। 'বন' বলতে পারে না।	পাশাপাশি অক্ষর দিয়ে সোজা শব্দ 'বন' বলতে পারে। কিন্তু আ-কার ই-কারের সামর্থ্যে না পৌঁছানর 'বনানী' বলতে পারে না।	আ-কার, ই-কারের সামর্থ্য অর্জিত হল। 'বনানী' বলতে পারল কিন্তু তখনও যুক্তাক্ষর না জানায় 'বন্দনা' বলতে পারল না।	বন্দনা, বনানী সব বলতে পারে। সহজ থেকেকঠিন উচ্চতর সামর্থ্য অর্জিত হল।		
১	সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় নেই ঃ সামর্থ্য শূন্য অতএব ২ চেনে	সংখ্যা ১ থেকে ৯ চেনে কিন্তু ২৮ জানে না।	১ থেকে ৯৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা চেনে কিন্তু ১২৮ চেনে না।	তিন অংকের সংখ্যা চেনে কিন্তু ১৯২৮ জানে না।	২, ৮, ২৮, ১২৮, ১৯২৮ সব চেনে। উচ্চতর সামর্থ্যে উঠে গেছে।		
গণিতের ক্ষেত্রে	না।						
২	ঐ	২ চেনে, ৮ চেনে ২৮ জানেনা	২৮ জানে, কিন্তু ২৮ + ৪ জানে না।	২৮ + ৪ জানে ২৮ - ৪ জানে না।	২৮ - ৪ জানে ২৮ X ৪ জানে না।	২৮ X ৪ জানে ২৮ ÷ ৪ জানে না।	২৮ ÷ ৪ জানে।

সামর্থ্য অর্জনের ব্যাপারে এখন যে প্রশ্নটি এসে যায় সেটি হল, একসঙ্গে সব ছাত্রছাত্রীই কি এই সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে? আমাদের আগের উদাহরণটির সূত্র ধরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা গেল দশজন শিক্ষার্থীর মধ্যে নয়জন হয়ত 'ব' চিনল ও বলতে (স্পষ্ট উচ্চারণে) পারল। একজন পারল না। তখনই আসে সামর্থ্য-ভিত্তিক পঠন-পাঠন প্রকৌশলের মূল বিষয়— সংশোধনী পাঠের কথা। যে শিশুটি পারল না, তাকে প্রয়োজন হলে কোলে বসিয়ে আদর করে, তার অভিব্যক্তিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে (শিশু কেন্দ্রিক) আরও আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদান করে, তাকে সক্রিয় করে তুলে (আনন্দপাঠ) তাকে সামর্থ্যের বিচারে অন্যদের সঙ্গে সমতুল্য করে তোলা। শেষ পর্য্যন্ত সেও 'ব' চিনবে ও বলতে পারবে। এটাই হল সংশোধনী পাঠ। সংশোধনী পাঠ তাহলে দাঁড়াল শিক্ষকের দিক থেকে আরও বেশী যত্ন নেওয়া, নিষ্ঠার সঙ্গে আরও বেশী পরিশ্রম করা, আরও বেশী আকর্ষণীয় ভাবে পাঠ প্রদান করার ব্যাপার। সেনা বাহিনীতে প্যারেড শেখানোর উদাহরণ এখানে টেনে আনা যেতে পারে। যে কয়েকজন উপযুক্ত reflex action - এর অভাবে কমাণ্ড অনুযায়ী ডান পা বাঁ পা মিলিয়ে প্যারেড করতে পারল না তাদের সামরিক বাহিনী থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয় না। আরও চেষ্টা, অতিরিক্ত ড্রিল, ওস্তাদজীর ভাষায় যাকে বলে 'যাদা কোশিশ' তার মাধ্যমে তাদের অন্যদের সামর্থ্যের সমান করে তোলা হয়। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দশটি ফুলের চারাগাছ লাগান হয়েছে। তার মধ্যে সাতটি স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠছে। তিনটি ঠিকমত বাড়ছে না। এই তিনটিকে আমরা তুলে ফেলে দিই না। সার ইত্যাদি প্রয়োগ করে, আরও জল দিয়ে যত্ন নিয়ে তাদের বড় করে তুলি। এই প্রচেষ্টা সংশোধনী পাঠের দ্যোতক, শুধুমাত্র রূপের তফাৎ।

এরপর পাশফেল প্রথা চালু করার দাবীর কথায় আসি। আমি নিজে সারা কর্মজীবনে শিক্ষকতা করার পর এখনও শিক্ষার সঙ্গেই যুক্ত। একজন দরদী শিক্ষক- অভিভাবক হয়ে আমি কারও পাশের দাবী রাখতে পারি, কিন্তু ফেলের দাবী সমর্থন করতে পারি কি করে? আর এর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করলে আঁতকে উঠি। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য নীচে একটি ছক দিয়ে শুরু করি ঃ-

ছক - ২ ঃ- পাশফেল প্রথার স্বরূপ

শ্রেণী	শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	পাশফেল প্রথা (বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল)	
		পাশ	ফেল
প্রথম	প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হল ঃ ১০০ জন	৯০	১০
দ্বিতীয়	দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসল ঃ ৯০ জন	৮০	১০
তৃতীয়	তৃতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসল ঃ ৮০ জন	৭০	১০
চতুর্থ	চতুর্থ শ্রেণীতে আসল তৃতীয় শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মোট ঃ ৭০ জন	৬০	১০

উপরের উদাহরণ থেকে এটা পরিষ্কার যে শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীতে যাবে মাত্র ৬০ জন। বাকী ৪০ জনের মধ্যে বেশ কিছু স্কুলছুট হয়ে যাবে। এদের একাংশ হয়ত ক্রমে ক্রমে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর তাদের এই পরিণতির জন্য দায়ভার কি শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে পাশফেল সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর কিছু মাত্র বর্তাবে না? প্রশ্ন আসে, এই চল্লিশ জন আমাদের কাছে কি নিতে এসেছিল। এসেছিল শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ জীবনের মূলধন হিসাবে গড়ে নিতে। এই মূলধন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা বা জীবন-জীবিকার জন্য অত্যন্ত জরুরী। একজন স্কুল ছুট ভবিষ্যৎ জীবনে যখন চাষের কাজে নামল তখন সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদির দাম দরের সে হিসাব করতে জানে না। ওজন বোঝে না। প্রতিপদে সে অন্যদের কাছে হীনমন্যতার শিকার, উপেক্ষা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা যেন তার সহজ প্রাপ্য। সে সংবাদপত্র পড়তে পারে না। পারে না এমনকি তার অতি প্রিয়জনের কাছে পত্র লিখতে বা তাদের লেখা পত্র পড়তে। এই শাস্তি তাকে আমৃত্যু দিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশফেল প্রথা।

কিন্তু যদি ওই ১০০ জন ছাত্রকে চার বছর ধরে যত্ন করে কোলে পিঠে রেখে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক পাঠদানের মাধ্যমে, পর্ব ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা করে তাৎক্ষণিক ও সাময়িক মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং সবশেষে পিছিয়ে যাতে না পড়ে তার জন্য প্রথম থেকেই সংশোধনী পাঠদানের মাধ্যমে

আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তবে তো এ সমস্যা আমাদের পীড়িত করতে পারে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহ সকলকে স্কুলের গণ্ডী পার করিয়ে দিতে পারাটাই হবে আমাদের পরম প্রাপ্তি। কাউকে আটকে রাখা বা ফেল করানো নয়। প্রতিটি শিক্ষণ শিবিরে আমি প্রশ্ন রেখেছি — আপনারা শিক্ষকেরা বলুন আমাদের এই প্রকৌশলকে বাস্তবে প্রয়োগ করা কি অসম্ভব? এটা কি নিছক দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনা? সমস্বরে উত্তর এসেছে ''না'', 'কখনই নয়।'

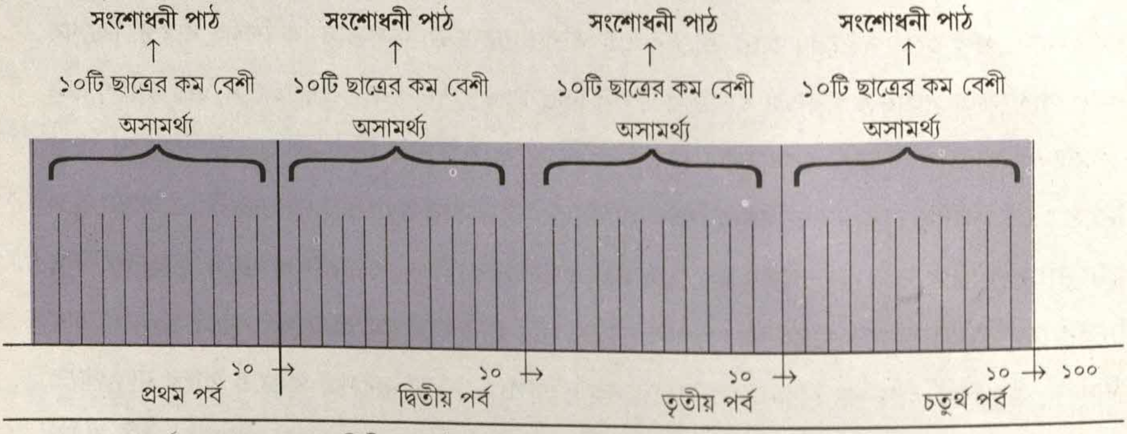
আসলে মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। আর এই হিসাবে আমাদের প্রকৌশলের বাস্তব প্রয়োগ আদৌ দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনা হতে পারে না। একটি ছকের সাহায্যে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি। ২নং ছকটি এটির পাশে প্রতিস্থাপন করে নিলে বোঝার আরও সুবিধা হবে-বলে মনে হয়।

ছক ঃ ৩

সংশোধনী পাঠ ঃ সাফল্যের মূলসূত্র

মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ ১০০

পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের ফলাফল



প্রথম পর্বের মূল্যায়ন ঃ ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় সামর্থ্যে পৌঁছাতে পারেনি	দ্বিতীয় পর্বের মূল্যায়ন ঃ ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় সামর্থ্যে পৌঁছাতে পারেনি	তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন ঃ ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় সামর্থ্যে পৌঁছাতে পারেনি	চতুর্থ পর্বের মূল্যায়ন ঃ ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় সামর্থ্যে পৌঁছাতে পারেনি

['→' =সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।]

প্রথম পর্বে সামর্থ্য ভিত্তিক তাৎক্ষণিক ও সাময়িক মূল্যায়নের ফলে দেখা গেল দশ জন ছাত্র প্রয়োজনীয় সামর্থ্য অর্জন করতে পারছে না। তখনই শুরু হবে তাদের জন্য সংশোধনী পাঠ-দান। অক্ষমতা বা অসামর্থ্য কম বেশী হতেই পারে। কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সংশোধনী পাঠ ফলপ্রসূ হবেই। তাদের অক্ষমতা-অসামর্থ্য দূর করে দ্বিতীয় পর্বে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আবার মূল্যায়নে ধরা যাক আবার দশ জন ছাত্রই (তা সে যে কোন দশ জনই হতে পারে) প্রয়োজনীয় সামর্থ্য অর্জন করতে পারল না। আবার সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে তাদের অন্যদের সমান পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। শুধু পর্বভিত্তিক মূল্যায়নই নয়, তাৎক্ষণিক, সাময়িক, নিরবিচ্ছিন্ন (সামর্থ্য ভিত্তিক) মূল্যায়ন কাউকে অসমর্থ বিচার করলে শুরু করতে হবে সংশোধনী পাঠ। এভাবে একেবারে শুরুতেই অক্ষমতা নির্ধারণ করে নিতে পারলে সংশোধনী পাঠ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সামর্থ্যে ছাত্রকে পৌঁছে দেবে তাই নয় পরবর্তী পর্য্যায়ে সে যাতে আর পিছিয়ে না পড়ে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা সহজ হবে। ছক নং ২ কে যদি ছক নং ৩ এর পাশে স্থাপন করি তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ৪০ জন তো দূরের কথা কোন ছাত্রই আর আটকে থাকতে পারে না। ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনকেই আমরা স্কুলের গণ্ডী পার করে দিতে পারি।

সামর্থ্য অর্জনের অপারগতা বা অসামর্থ্যকে যদি আমরা সর্পদংশনের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে পুরাতন পাশফেল ব্যবস্থায় ওই দংশনের বিষের প্রকাশ ঘটবে যান্মাষিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার মূল্যায়নের পর যখন বিষ প্রতিরোধের সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। অপারগতা যখন যান্মাষিক পরীক্ষার পর জানা যাবে তখন বিষ কোমর পর্য্যন্ত উঠে গেছে। আর বার্ষিকের পর উঠে গেছে মাথায়। তখন আর বিষ ছাড়ানো তো দূরের কথা তাগা বাঁধার সুযোগ পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু নুতন ব্যবস্থায় প্রতিটি পর্য্যায়ে তাৎক্ষণিক, সাময়িক, পর্বভিত্তিক মূল্যায়নে অসামর্থ্য চিহ্নিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনী পাঠ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। আমি নিজে একজন শিক্ষক হিসাবে প্রতিটি শিক্ষানুরাগী অভিভাবক, শিক্ষকের কাছে আবেদন জানাই, যে বাস্তববোধ, যুক্তিতর্ক ও অভিজ্ঞতার নিরিখে আমাদের এই পঠন-পাঠন প্রকৌশল গঠিত তার মধ্যে যদি কোন ভুল বা অসংগতি আপনি বোধ করেন তা আমাদের অকপটে জানান। অসুন আমরা আলোচনা করি। যে যুক্তির-তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা টলে যাবার নয় বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এরপর আমরা ন্যূনতম শিখনের মান বা এম এল এল সম্পর্কে আলোচনায় আসতে পারি। গোড়াতেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে এম এল এল সম্পর্কে প্রচুর বিভ্রান্তি আগে ছিল। এখন তা অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। এম এল এল কি? এটা কি একটা পাশ মার্ক না কি শিখনের এমন একটা স্তর যা সব শিক্ষার্থীকেই সব বিদ্যালয়ে অর্জন করতে হবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির পার্থক্য থাকে তেমনি পার্থক্য থাকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে পাঠদান ক্ষমতার, অবলম্বিত প্রকৌশলের অথবা বিদ্যালয় পরিবেশের। উপাদানগুলির এত যেখানে ভিন্নতা সেখানে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিক্ষার মানের একটা সমতা আনার সমস্যা থেকেই যায়। এম এল এল আসলে হল এই সমস্যা সমাধানের অর্থাৎ এই জাতীয় একটা সমতা আনার প্রকৌশল বা স্ট্র্যাটিজি। It is means to an end and not an end in itself.

নীচের ছকটির সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানে আমরা তিনটি উপাদানকে variable ধরেছি এবং এদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ধারিত হয় ধরে নিচ্ছি ঃ-

ছক ঃ ৪

বিভিন্ন Variable-এর সম্মিলিত

শক্তির ফলে অর্জিত বিদ্যালয়ের মান

ছাত্র-ছাত্রীর গ্রহণ ক্ষমতা বুদ্ধিবৃত্তির স্তর		শিক্ষকের পাঠদান নৈপুণ্য		অবলম্বিত প্রকৌশল		বিদ্যালয়ের মান
ক	X	খ	X	গ	=	গ
(ক + ১)	X	(খ + ১)	X	(গ + ১)	=	খ
(ক - ১)	X	(খ - ১)	X	(গ - ১)	=	ঘ
(ক + ২)	X	(খ + ২)	X	(গ + ২)	=	ক
(ক - ২)	X	(খ - ২)	X	(গ - ২)	=	ঙ

Variable গুলির মূল্য	মানের স্তর বিন্যাস ঃ-
ক	৯০ - ১০০
খ	৮০ - ৮৯
গ	৭০ - ৭৯
ঘ	৬০ - ৬৯
ঙ	৫০ - ৫৯

বিদ্যালয় অনুযায়ী উল্লিখিত ক, খ, গ, ঘ, ঙ সমস্ত মানই এম এল এল। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের একটি স্কুলে যেখানে প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়ারাই বেশী এবং যেখানে বিশেষ দক্ষ শিক্ষক পাওয়া যায় নি, উপযুক্ত শিক্ষাপোকরণের অভাবে অবলিম্বত প্রকৌশলও যেখানে নড়বড়ে সেখানে শিক্ষার যে মান অর্জিত হয় তা কখনও কলকাতার মত শহরের স্কুলের যেমন হিন্দু স্কুলের অর্জিত মানের সমান হতে পারে না। আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের কথাই ধরছি। কিন্তু যে বিষয়টি সব থেকে বেশী মনে রাখা দরকার সেটি হল যে কোন মানই অর্জন করা হোক না কেন সেই মানের ঊর্দ্ধমুখিতা এবং সকল ছাত্রের মধ্যে অর্জিত মানের সমতাই হবে সবচেয়ে বেশী কাম্য। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক দাভের ভাষায় ন্যূনতম শিখনের মান বা এম এল এল-এর অর্থ তাহলে দাঁড়াল ঊর্দ্ধমুখী, উপযুক্ত গুণগতমান (Quality) ও তার সমতা (Equity)। আরও পরিষ্কার করে বললে যে স্কুল 'ঙ' পর্য্যায়ের মানে পৌঁছেছে তাকে চেষ্টা করতে হবে 'ক'-মানে পৌঁছতে। অনুরূপভাবে যারা 'ক' মানের নীচে আছে তাদের চেষ্টা করতে হবে 'ক'-মানে পৌঁছতে। আর যারা 'ক'-মানে পৌঁছে গেছে তারা গল্পে বর্ণিত খরগোশের মত ঘুমোবেনা। তারা (ক +১) বা (ক + ২) ইত্যাদি মানে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে। সেখানে বলা যেতে পারে আকাশই হচ্ছে সীমা। এক কথায় বলতে গেলে গুণগত মানকে নিয়ে যেতে হবে Mastery level-এ বা পারদর্শিতার স্তরে। কাজেই গুণগতমান বা Quality (Q) হচ্ছে পারদর্শিতার পর্য্যায়ের সামর্থ্য। চিহ্ন ব্যবহার করে বলতে পারি,

গুণগতমান = সামর্থ্য + পারদর্শিতার স্তর

আর সমতার অর্থ হল ৩০ জন ছাত্র ক্লাসে থাকলে যে মানটি অর্জিত হ'ল বা হবে তা সে যে

স্তরেই হোক না কেন সকল ছাত্রই আবশ্যিকভাবে সেই মান অর্জন করল বা করবে। তিরিশ জনের মধ্যে আঠাশজন সেই মান অর্জন করল কিন্তু বাকি দুজন পারল না। তাহলে সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে বাকী দুজনকে সেই আঠাশ জনের অর্জিত মানের সামিল করতে হবে। চিহ্ন ব্যবহার করে বলতে পারি ঃ-

ন্যূনতম শিখনের মান বা এম এল এল = গুণগত মান + সেই মানের সমতা।

আগেই দেখিয়েছি, গুণগত মান = সামর্থ্য + পারদর্শিতার স্তর

তাহলে দাঁড়াল ঃ এম এল এল = সামর্থ্য + পারদর্শিতার স্তর + সামর্থ্য ও পারদর্শিতার সমতা অর্থাৎ শিখনের ন্যূনতম মানের অর্থ দাঁড়াল সকল ছাত্রের পারদর্শিতার স্তরে অর্জিত সামর্থ্য।

মনে পড়ে কোন একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের জনৈক শিক্ষিকার প্রশ্নের উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম শিক্ষক শিক্ষিকারা যদি সময়মত স্কুলে আসেন এবং ঠিক সময়ে স্কুল পরিত্যাগ করেন আর দুয়ের মধ্যবর্তী সময়টিতে অর্থাৎ School Hours -এ আদর করে, সোহাগ ভরে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করেন তাহলে সহজেই তারা এম এল এল অর্জন করতে পারবে এবং ক্রমে সেই স্তর হবে ঊর্দ্ধগামী আর তা সমানভাবে অর্জিত হবে সকল ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারাই। গোটা বিদ্যালয়ই পৌঁছে যাবে নির্দিষ্ট গুণমানে।

বর্তমানে বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত শ্রেণীকক্ষটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মোটামুটিভাবে সেখানে তিন ধরণের ছাত্র-ছাত্রী গোষ্ঠী আছে। প্রথম তিনটি বেঞ্চ দখল করে আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা। তারপর তিনটি বেঞ্চ দখল করে আছে ব্যবসায়ী, সম্পন্ন চাষী, দোকানদার বা বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা। প্রাথমিক পর্য্যায়ের শিক্ষার পর এদের অনেকেই হয়ত আর এগোবে না। কিন্তু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল শেষ তিনটি বেঞ্চ যেখানে বসে আছে প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়ারা। এদের পিতামাতারা হয়ত নব সাক্ষরদের দলে অথবা নিরক্ষরই। এদের বাড়ীতে পাওয়া যাবে না ছাপানো কোন কাগজ। এদের মধ্যে আছে লাজুকভাব, জড়তা, আড়ষ্টভাব হয়ত বা কিছুটা নিষ্ক্রিয়তাও। আর আছে নিঃসীম দারিদ্র, অপুষ্টি, আর নানাবিধ মানসিক যন্ত্রণা। আর এই শেষ তিনটি বেঞ্চই আমাদের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। শেষ বেঞ্চের বাঁ কোণের দিকে যে মেয়েটি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে হয়ত খেয়ে আসেনি। কবির ভাষা মনে পড়ে যায় ঃ-

'কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান   কেহ রোগে ম্রিয়মান

শ্রমে কারও চাহনি করুণ'

আর অধ্যাপক দাভের ভাষায় এরা হল আসলে মনের দিক থেকে স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন বা মানসিক ভাবে স্কুল ছুট। কিন্তু শিক্ষকদের যেতে হবে এদের কাছেই। বসতে হবে এদের পাশে। বুঝতে হবে এদের সমস্যা। জড়তা, আড়ষ্টতা দূর করে জাগাতে হবে এদের। তবেই হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠ। তবেই হবে এম এল এল নামক প্রকৌশলে সার্থক প্রয়োগ।

আনন্দপাঠ বা Joyful learning প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে খুবই গুরুত্বপুর্ণ। সামর্থ্য অর্জন করার জন্য শিশুর সক্রিয়তা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর যা কিছু তার কাছে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় তাই তার সক্রিয়তাকে জাগিয়ে তোলে। আর এই হিসাবে শিক্ষার পরিমণ্ডলকে আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় করে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয়। এটাই হ'ল Joyful learning বা আনন্দপাঠের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি। ভেবে অবাক হতে হয় যে আজ থেকে বহু দিন আগেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে পঠন-পাঠন ব্যবস্থায় প্রচলন করেছিলেন আনন্দপাঠের। একথা ঠিক, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডল থাকে না। কিন্তু পশ্চিমবাংলার প্রকৃতি অকৃপণ। তার থেকেও বড় হল শিক্ষকের হৃদয়ের ভালবাসা, দরদ আর মুখের স্নেহময় হাসি ও অপার প্রশান্তি। এ সম্পদ আপনার আমার সকলেরই আছে। কিন্তু বাড়ীর চৌহদ্দি পেরুলেই যেন সেটি চাপা না পড়ে যায়। আসলে আনন্দপাঠের মূল কথা হ'ল শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে বিরাজমান একটি হাসিখুশি, আনন্দদায়ক পরিমণ্ডল। শিক্ষার্থী, শিক্ষক উভয়েই এই পরিমণ্ডলে আসতে আগ্রহী, কারণ, এই নির্মল, আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় পরিবেশ তাদের দেয় অপার আনন্দ, যা তাদের মধ্যে আনে পঠন-পাঠন এর জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা।

আজকাল আবার ব্যাঙের ছাতার মত কিছু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমন কিন্ডারগার্টেন, মন্তেশ্বরী স্কুল ইত্যাদি গ্রামে গঞ্জে গজিয়ে উঠছে। সংক্ষেপে এগুলিকে বলা হচ্ছে 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল'। আসলে আমাদের উপরে বর্ণিত পঠন-পাঠন প্রকৌশলের মূলনীতিগুলি প্রয়োগের ব্যর্থ চেষ্টা চলে এই সব প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষা এখানে অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। পাঠ্যসূচী

ভারাক্রান্ত, একাধিক ভাষার ভারে কখনও বা একপেশে, আর শিক্ষকদের যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত নয়। নিয়োগ স্বজন পোষণে আক্রান্ত। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে অপরপক্ষে ছাত্রদের কোন বেতন তো লাগেই না পাঠ্যপুস্তকাদি দেওয়া হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শিক্ষক নিয়োগ অবশ্যই যোগ্যতার বিচারে হয়। আর আছে শিক্ষকদের চাকুরীর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়াও উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকুরীর অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। অমাদের বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষাই হল মাতৃদুগ্ধ আর ওই সব স্কুলগুলিতে মাতৃভাষাও পিটুলী পর্য্যায়ের। ছাত্ররা কিছু Nursery rhyme ভাল বলতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা সত্যেন দত্তের নাম শোনেনি। জানে না বিদ্যাসাগরের নাম। দেশপ্রেমের বীজ এদের মধ্যে উপ্ত না হবার ফলে এরা জানে না মাতঙ্গিনী হাজরা বা ক্ষুদিরামের নাম, বোঝে না স্বামী বিবেকানন্দ বা নেতাজীর দেশপ্রেম। শ্রমজীবি মানুষের প্রতি ভালবাসা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধগুলি এদের পঠন-পাঠনে যথোচিত গুরুত্ব পায় না। শুধু তীব্র প্রতিযোগিতার তাড়নায় শিশু বয়স থেকেই এদের সর্ববিদ্যা বিশারদ্ করে গড়ে তোলার জন্য চলে অবিরাম প্রচেষ্টা। পরবর্তী জীবনে এদের দু-একজন সাফল্য লাভ করলেও বেশীর ভাগই হয়ে পড়ে তীব্র হতাশার শিকার যা আরও পরে এদের লিপ্ত করে ফেলে মারাত্মক ড্রাগের নেশায়। যারা দু-একজন সাফল্য লাভ করল আত্মসুখই তাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এরা নিজের স্ত্রী-পুত্র ছাড়া আর কারও প্রতি এমনকি নিজের মা-বাবা যারা সর্বস্ব পণ করে এদের মানুষ করেছে তাদের প্রতিও এরা ন্যূনতম কর্তব্য করতে চায় না। বৃদ্ধবয়সে মা বাবার জায়গা হয় বৃদ্ধাশ্রমে। এটা কখনও আমাদের ব্যবস্থার সুস্থ বিকল্প হতে পারে না, প্রকৃত সমান্তরাল তো নয়ই। এই শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ব্যবসা আর এর মূলমন্ত্র মুনাফা আর মুনাফা।

সবশেষে আসি আমাদের শিক্ষকদের ভূমিকার কথায়। এপ্রসঙ্গে যে কথাটি আমি খুব জোরের সঙ্গে বলে থাকি সেটি হল একজন শিক্ষক তাঁর ক্লাসে 'সার্বভৌম' (Sovereign)। তাঁর নির্দেশ, কথাবার্তা, উদ্যোগ, আয়োজন সবই সেখানে শেষ কথা। পঠন-পাঠন এর সাফল্য মূলত তার পরিকল্পনা, চিন্তা শক্তি, প্রকৌশল প্রয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। উপরে যে Joyful learning বা আনন্দপাঠের কথা উল্লেখ করেছি সেটাও মূলতঃ নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। তিনি গান গেয়ে, হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে, কখনও বা খেলাধূলার মাধ্যমে কখনও বা

তাদের কোলে বসিয়ে ইত্যাদি নানা উপায়ে পাঠদান করবেন। হৃদয়বত্তাই এখানে সবচেয়ে বড়ো উপাদান। তবেই পাঠদান হবে শিশু কেন্দ্রিক। হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা পাবে গুরুত্ব। এটা মনে রাখা দরকার শিক্ষকতা হবে শুধু তার পেশা নয়, নেশাও। এই নেশাই তাকে এনে দেবে সাফল্যের সুখ। আজকের দিনে শিক্ষকের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার বা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। ভবিষ্যৎ জাতি গঠন তার হাতেই। শিক্ষকদের নানা সমস্যার প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। এসে পড়ে পঠন-পাঠন পরিবেশের সমস্যার কথা, শিক্ষাপোকরণের অভাবের কথা। কিন্তু এসব সমস্যার মধ্য দিয়েই, এদের সঙ্গে লড়াই করেই এগিয়ে যেতে হবে, চুপচাপ বসে থাকলে সমস্যার সমাধান হয় না। হবে না। আমার মনে পড়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের পতিরাম ফ্রিপ্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শ্রী বিজন কুমার সাহার কথা। গ্রামে গ্রামান্তরে প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই আমি তার সাক্ষাৎ পাই। জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত শ্রী সাহা শিক্ষকদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত। শিক্ষক তাঁর একক প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন শ্রী সাহা তারই নমুনা। আমাদের সবার অনুসরণের যোগ্য। তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের তৈরী ডকুমেন্টারী তাই আমরা টেলিভিশনে জাতীয় কার্য্যক্রমে সম্প্রচার করতে পেরেছি।

The Jacques Delors Commission যা আসলে International Commission on Education for the Twenty-first Century, তার রিপোর্ট "Learning, The Treasure Within"-এ শিক্ষার চারটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

★ Learning to know
★ Learning to do
★ Learning to live together
★ Learning to be

শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে উপরে যে অলোচনা করেছি, তারই প্রতিফলন ঐ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে। ঐ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক উপরিউক্ত চারটি স্তম্ভকে যথাযথভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হবে বলে আমার ধারণা। শিক্ষকের কাজকর্ম সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্য থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিয়ে আমার অলোচনা শেষ করি ঃ "Even though teaching is essentially a solitary activity in the sense that each teacher is faced with his or her own responsibility and professional duties, teamwork is essential in order to improve the quality of education and adapt it more closely to the special characteristics of classes or groups of pupils".

—●—


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের উদ্যোগে
হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ব্যবস্থাপনায়
বিশেষ অভিমুখীকরণ কর্মসূচী





